অধ্যায় - ৩০

শিরডীতে আনয়ন- ১) বণীর কাকা বৈদ্য ২) খুশালচন্দ ৩) বম্বের রামলাল পাঞ্জাবী।

এই অধ্যায়ে আরো তিনটি ভক্ত কিভাবে শিরডীর টানে সেখানে গিয়ে পৌঁছয়, সে কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

যিনি বিনা কোন কারণে ভক্তদের স্নেহ করেন, দয়ার সাগর এবং নির্গুন হয়েও ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়ে যিনি স্বেচ্ছায় মানব শরীর ধারণ করেছিলেন, যিনি এইরূপ ভক্তবৎসল যে, তাঁর দর্শন মাত্রেই ভবসাগরের ভয় ও সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়, সেই শ্রী সাইনাথ মহারাজকে আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। ভক্তদের আত্মদর্শন করানোই সন্তদের প্রধান কাজ। সন্ত শিরোমণি শ্রী সাইয়ের ছিল এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যারা তাঁর শ্রী চরণের শরণে যায়, তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে দিন-প্রতিদিন উন্নতি হতে থাকে। তাঁর শ্রীচরণ স্মরণ করে পবিত্র স্থান থেকে ভক্তরা শিরডীতে আসত এবং তাঁর কাছে বসে শাস্ত্র পাঠ করত, গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করত। কিন্তু যারা নির্বল এবং সর্বপ্রকারে দীন-হীন এবং যারা এও জানে না যে ভক্তি কাকে বলে, তাদের শুধু একটাই বিশ্বাস যে, সবাই ওদের অসহায় ছেড়ে উপেক্ষা করতে পারে- কিন্তু অনাথের নাথ এবং প্রভু শ্রীসাই ওদের কখনো পরিত্যাগ করবেন না। যার উপর তিনি কৃপা করেন, সে প্রচণ্ড শক্তি, নিত্যানিত্যে বিবেক ও জ্ঞান সহজেই লাভ করে।

তিনি নিজের ভক্তদের ইচ্ছে জেনে সেটি পূরণ করেন। তাই ভক্তদের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয় এবং তারা কৃতজ্ঞ বোধ করে। আমরা তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে প্রার্থনা করছি যে- "হে সাই, আমাদের ভুল-ত্রুটির দিকে মন না দিয়ে আমাদের সমস্ত কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নাও।" যে বিপদগ্রস্ত প্রাণী এই ভাবে শ্রী সাইয়ের কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর কৃপায় যে পূর্ণ শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে। শ্রী হেমাডপন্ত বলেন যে- "হে, আমার সাই। তুমি তো দয়ার সাগর। এ তো তোমারই দয়ার ফল যে আজ এই 'সাই সৎচরিত্র' ভক্তদের হাতে পৌঁছতে পেরেছে। নতুবা আমার সেই যোগ্যতা কোথায় যে এমন কঠিন কাজ হাতে নেওয়ার দুঃসাহস করতে পারি? যখন সম্পূর্ণ উত্তরদায়িত্ব তুমি নিজের উপরই নিয়ে নিয়েছ তখন আমার তিলমাত্র ভার অনুভব হচ্ছে না। আমার

আর কোন চিন্তা নেই।" শ্রীসাই এই গ্রন্থের রূপে শ্রী হেমাডপন্তের সেবা স্বীকার করেন। এটি শুধু ওঁর পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কারের জন্যই সম্ভব হতে পেরেছে। তাই উনি নিজেকে ভাগ্যবান ও কৃতার্থ মনে করেন।

নীচে লেখা ঘটনা কপোলকল্পিত নয় বরং বিশুদ্ধ অমৃত। এটি যে হৃদয়ঙ্গম করবে, সে শ্রী সাইয়ের মহানতা ও সর্বব্যাপকতা সহজেই জানতে পারবে। কিন্তু যে যুক্তি-তর্ক বা সমালোচনা করতে ইচ্ছুক তার এই কথাগুলির দিকে কান দেওয়ার দরকার নেই। এখানে তর্ক নয় বরং প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তির প্রয়োজন। বিদ্বান, ভক্তমান, গভীরভাবে বিশ্বাসী যাঁরা বা যাঁরা নিজেদের সাই পদ সেবক মনে করেন, তাদেরই এই কথাগুলি রুচিকর ও শিক্ষাপ্রদ মনে হবে। অন্য লোকেদের জন্য তো এগুলি কেবল কপোল কল্পনা। শ্রী সাইয়ের অন্তরঙ্গ ভক্তদের শ্রীসাই লীলাগুলি কল্পতরুর মতন মনে হবে। শ্রীসাই লীলারূপী অমৃত পান করলে অজ্ঞান জীবেরা মোক্ষ, গৃহস্থরা শান্তি এবং মুমুক্ষুজন সাধনার এক সর্বোচ্চ পথ লাভ করবেন। এবার আমরা এই অধ্যায়ের মূল কথায় আসব।

কাকাজী বৈদ্য ঃ-

নাসিক জেলার বণী গ্রামে কাকাজী বৈদ্য নামক এক ব্যক্তি থাকতেন। উনি সপ্তশ্রুঙ্গী দেবীর প্রধান পুরোহিত ছিলেন। একবার উনি এমন বিপদে পড়েন হন যে মনের শান্তি হারিয়ে ব্যকুল হয়ে ওঠেন। একদিন উনি দেবীর মন্দিরে গিয়ে অন্তঃকরণ হতে প্রার্থনা করেন যে "হে দেবী, হে দয়াময়ী! আমায় এই কষ্ট থেকে শীঘ্র মুক্ত করো।" ওঁর প্রার্থনায় দেবী প্রসন্ন হন এবং ঐ রাত্রিতেই ওঁকে স্বপ্নে বলেন- "তুই বাবার কাছে যা। ওখানে তোর মন শান্ত ও স্থির হয়ে যাবে।" বাবার পরিচয় জানবার জন্য কাকাজী অতন্ত উৎসুক ছিলেন, কিন্তু দেবীকে প্রশ্ন করার আগেই ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এবার উনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন- ইনি কোন বাবা যার দিকে দেবী ইঙ্গিত করছেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তাঁর এটাই মনে হলো যে সম্ভবতঃ দেবী ত্রয়্যম্বকেশ্বরবাবার (শিব) কথা বলেছেন। তাই উনি পবিত্র তীর্থ ত্রয়্যম্বক (নাসিক) গিয়ে দশ দিন থাকেন। সকাল-সকাল উঠে স্নান ইত্যাদি সেরে রুদ্র মন্ত্রের জপ করতেন। কিন্তু তাতেও মনের অশান্তি দূর হয় না। তখন উনি বাড়ী ফিরে আবার অতি করুণ স্বরে দেবীর স্তুতি করেন। সেই রাত্রিতে দেবী ওঁকে স্বপ্নে পুণঃ দর্শন দিয়ে বলেন- "তুই মিছিমিছি ত্রয়্যম্বকেশ্বর গেলি। বাবা বলতে আমি শিরডীর শ্রীসাই বাবার কথা বলেছিলাম।" এবার কাকাজীর প্রধান চিন্তা হল যে, কি করে এবং কখন শিরডী গিয়ে বাবার শ্রীদর্শন

করা যেতে পারে।

যথার্থে যদি কোন ব্যক্তি কোন সন্তের দর্শন হেতু আতুর হয়ে ওঠে তাহলে শুধুমাত্র সেই সন্তই নয়, ভগবানও তার ইচ্ছে পুরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সন্ত ও অনন্ত একই এবং তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি কেউ মনে করে যে সে নিজে গিয়েই সন্তের সঙ্গে দেখা করবে তাহলে সেটা হবে একটা দম্ভ। **সন্তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর দর্শন কে লাভ করতে পারে?** তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়তে পারে না। **সন্ত দর্শনের উৎকণ্ঠা যত তীব্র হয় সেই অনুপাতেই ভক্তি ও বিশ্বাস বাড়ে এবং ততই তাড়াতাড়ি মনোস্কাম পূর্ণ হয়।** যে নিমন্ত্রণ দেয়, অতিথি সৎকারের ব্যবস্থাও সে-ই করে। কাকাজীর ক্ষেত্রে ঠিক এমনটি হয়।

শামার বিশ্বাস ঃ-

যে সময় কাকাজী শিরডী যাত্রার কথা মনে-মনে স্থির করেছিলেন, সেই সময়ই ওঁর বাড়ীতে এক অতিথি (শামা) এসে পৌঁছন। উনি ঠিক এই সময়ে বণীতে কেন এবং কি করে এসে পৌঁছন এবার আমরা সেই দিকে দৃষ্টি দিই। ছোটবেলায় উনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওঁর মা নিজের কুলদেবী সপ্তশৃঙ্গীর কাছে প্রার্থনা করেন- "যদি আমার ছেলে সুস্থ হয়ে ওঠে, তাহলে আমি তাকে তোমার চরণে নিয়ে আসব।" কিছু বছর পর শামার মায়ের বুকে দাদ হয়। তখন উনি আবার দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন- "যদি আমি রোগমুক্ত হয়ে যাই তাহলে আমি তোমায় দুটো রূপোর স্তন অর্পণ করব।" কিন্তু এই দুটি মান্‌সিকই অপূর্ণ রয়ে যায়। মৃত্যুর আগে শামাকে নিজের কাছে ডেকে ওঁর মা ঐ দুটি মান্‌সিক মনে করিয়ে সেগুলি পূর্ণ করার আশ্বাস পেয়ে প্রাণত্যাগ করেন। কিছুদিন পর শামা নিজের প্রতিজ্ঞার কথা একেবারেই ভুলে যান এবং এই ভাবে ৩০ বছর কেটে যায়। এক সময় এক বিখ্যাত জ্যোতিষী শিরডী এসে সেখানে প্রায় মাস খানেক ছিলেন। শ্রীমান বুটী সাহেব এবং অন্য লোকেদের যা-যা ভবিষ্যবাণী করেছিলেন সেগুলি প্রায়-প্রায় ঠিক প্রমাণিত হয় । তাই সবাই খুব সন্তুষ্ট হয়। শামার ছোট ভাই বাপাজীও ওঁকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তখন উনি জানান- "তোমার বড় ভাই নিজের মাকে মৃত্যুশয্যায় যা কথা দিয়েছিলেন, সেগুলি এখনো পুরণ না হওয়ায় দেবী অসন্তুষ্ট হয়ে ওঁকে কষ্ট দিচ্ছেন।" জ্যোতিষীর কথা শুনে শামার নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে। দেরী করা বিপজ্জনক হতে পারে ভেবে উনি তাড়াতাড়ি দুটি রূপোর স্তন তৈরী করিয়ে সেগুলি মস্‌জিদে নিয়ে গিয়ে

বাবার সামনে রাখেন। বাবাকে প্রণাম করে সেগুলি গ্রহণ করে তাঁকে বচনমুক্ত করতে প্রার্থণা করেন। শামা বলেন- "আমার জন্য ত মা সপ্তশৃঙ্গী আপনিই।" কিন্তু বাবা তাতে বলেন- "তুমি স্বয়ং এগুলি নিয়ে গিয়ে দেবীর চরণে অর্পণ করো।" বাবার অনুমতি ও উদী নিয়ে উনি বণীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন। পুরোহিতের-খোঁজ করতে-করতে উনি কাকাজীর বাড়ী এসে পৌছন। কাকাজী এই সময় বাবার দর্শন করার জন্য খুবই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং ঠিক এমনি সময় শামা সেখানে এসে পৌছন। এ কি চমৎকার যোগাযোগ? আগন্তুকের পরিচয় পেয়ে এবং তিনি যে শিরডী থেকে এসেছেন শুনে কাকাজী শামাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দুজনের মধ্যে 'সাই লীলা' সম্বন্ধে গল্প শুরু হল। শামা নিজের প্রতিজ্ঞা-কৃত্য পুরণ করে কাকাজীর সাথে শিরডী ফিরে যান। কাকাজী মস্‌জিদে পৌঁছে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়েন। ওঁর দু-চোখ থেকে প্রেমাশ্রুর ধারা বইতে থাকে এবং মন স্থির হয়ে যায়। দেবীর দৃষ্টান্ত অনুসারে বাবার দর্শন করা মাত্রে কাকাজীর মনের অশান্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং উনি পরম শান্তি অনুভব করেন। উনি আশ্চর্যান্বিত বোধ করছিলেন- এ কি অদ্ভুত শক্তি যে, কোন সম্ভাষণ বা প্রশ্নোত্তর না করেই বা কোনরকম আশীষ না পেয়েই, শুধুমাত্র দর্শনেই অপার প্রসন্নতা বোধ হচ্ছে! সত্যি দর্শনের মাহাত্ম্য তো একেই বলে। ওঁর তৃষিত দৃষ্টি সাই চরণেই নিবদ্ধ হয়ে যায় এবং উনি মুখ থেকে একটা কথাও বলতে পারেন না। বাবার অন্যান্য লীলা শুনে ওঁর খুবই আনন্দ হয়। উনি চিন্তা-ভাবনা ভুলে বাবার পদতলে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিলেন। শিরডীতে বারো দিন সুখে কাটিয়ে বাবার অনুমতি, আশীর্বাদ ও উদী প্রাপ্ত করে উনি নিজের বাড়ী ফিরে আসেন।

খুশালচন্দ (রাহাতা নিবাসী) ঃ-

প্রায় দেখা গেছে যে, ভোরবেলায় যে স্বপ্ন দেখা হয় সেটা জাগ্রত অবস্থায় সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে সময়ের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তারই এক উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে। বাবা একদিন তৃতীয় প্রহরে কাকাসাহেবকে টাঙ্গায় রাহাতা গিয়ে খুশালচন্দকে নিয়ে আসতে বলেন। খুশালচন্দের সাথে ওঁর অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। রাহাতা পৌঁছে কাকাসাহেব কুশালচন্দ্রকে এই খবরটি দেন। কথাটি শুনে খুশালচন্দ অবাক হয়ে বলেন- "দুপুরে খাবার পর আমি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ি। সেই সময় বাবা স্বপ্নে দেখা দিয়ে তক্ষুনি শিরডী আসতে বলেন। কিন্তু ঘোড়ার কোনরকম ব্যবস্থা না থাকার দরুণ আমি নিজের ছেলেকে তাঁর কাছে পাঠাই, এই খবরটা দিতে। ও যখন গ্রামের সীমানায় পৌঁছয়, তখনই সামনে দিয়ে টাঙ্গায় আপনাকে

আসতে দেখে।" এরপর ওঁরা দুজন ঐ টাঙ্গাতেই শিরডী রওনা হন। বাবার সাথে দেখা করে উনি খুব খুশী হন এবং বাবার এই লীলা দেখে খুশালচন্দ মুগ্ধ হয়ে যান।

বম্বের রামলাল পঞ্জাবী ঃ-

বম্বের এক পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ শ্রী রামলালকে বাবা স্বপ্নে এক মোহান্তর (সাধু) বেশে দর্শন দিয়ে শিরডী আসতে বলেন। কিন্তু রামলাল এই মোহান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। শ্রীদর্শনের তীব্র উৎকণ্ঠা তো ছিল, কিন্তু ঠিকানা না জানার দরুণ উনি বড়ই মুস্কিলে পড়ে যান। যে নিমন্ত্রণ দেয় সে আসবার ব্যবস্থাও করে রাখে এবং শেষে হলোও তাই। ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় বেড়াবার সময় একটা দোকানে রামলাল বাবার একটি ছবি দেখতে পান। স্বপ্নে যে সাধুর দর্শন হয়েছিল, তাঁর আর এই ছবিটির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানতে পারেন যে এই ছবিটি শিরডীর শ্রী সাইবাবার। উনি শীঘ্রই শিরডী অভিমুখে রওনা হয়ে যান এবং আমৃত্যু সেখানেই থাকেন।

এই ভাবে বাবা নিজের ভক্তদের দর্শনের জন্য শিরডী ডাকতেন এবং তাদের লৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত ইচ্ছে পুরণ করতেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।